নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(১৭)

মাঘ মাসের দুপুর বেলায় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বেল তলায় আপন মনে পুজো করে যাচ্ছেন, কেউ কোথাও নেই অথচ কাকে যেন উদ্দেশ্য করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে যাচ্ছেন—''মায়ের হরিনামের ঝুলি কেমন করে সৃষ্টি হল জানিস্? সেই আদিশক্তি মা ভগবতী একদিন গঙ্গাস্নানে বেরিয়েছে—গঙ্গাস্নানের মানে কি জানিস্? অনন্ত আলো-আঁধারকে অঙ্গে মেখে যে আদ্যা-প্রতিমা প্রথম জগৎ-সৃষ্টির কাজে নামল—তাকেই মায়ের গঙ্গাস্নান বলে। এই অনন্ত সূর্য্য-চন্দ্রকে অঙ্গে মেখে, মা জগত্তারিণী এই মর্ত্ত্য ভূমিতে নামতেই মায়ের প্রথম দেখা হল এক কালীমূর্ত্তির সঙ্গে, মা তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল আর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমায় হরিনাম শোনাতে পার?' সেই আদ্যা-কালীমূর্ত্তি এ কথায় কোন উত্তর না দিয়ে, শুধু তার জিভ্ বার করে দাঁড়িয়ে রইল, আর সঙ্গে সঙ্গে হল কি জানিস্? অনন্ত জীবকুলের সৃষ্টি হতে লাগলে। অনন্ত আকাশ-বাতাসে ওঁকারধ্বনি বেজে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে মা দেখল সেই অনন্ত কালের মহিমা ব্যক্ত করবার জন্য তারই পায়ের তলায় শিব জেগে উঠল — মা ভগবতী এদের দুজনকেই-'জীব! জীব! শিব! শিব।' বলে নিজের আঁচল ঝুলিতে পুরে ফেলল—মায়ের মর্ত্ত্যভূমিতে একেই বলে প্রথম মহাবিদ্যার সৃষ্টি বা প্রথমদিকের সৃষ্টি।''

(ঠিক এই দুপুর বেলার পূজার সময় রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু রামকৃষ্ণদেবকে তাঁর নিজের আসনে বসে থাকতে না দেখে, তাঁর খোঁজে বেরুলেন আর এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সেই বেলতলার কাছে তাঁকে বিহ্বল অবস্থায় পুজো করতে দেখে অলক্ষ্যেই দাঁড়িয়ে তাঁর পূজার বাণী শুনতে লাগলেন)—

রামকৃষ্ণদেব চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে যাচ্ছেন -''মায়ের এ অবস্থার হরিনামের ঝুলিকে কি বলে জানিস্? — একেই শিবের ঝুলি বলে। মা নামের অনন্তকালের কথা, কুলের কথা এই শিবের ঝুলিতেই পাওয়া যায়, সেইজন্যই সেই আদ্যামায়ের এক নাম মা-কালী। এই শিবের ঝুলি হাতে করতেই ঝোলা থেকে যে প্রথম হরিনামের ধ্বনি বেরিয়ে এল, তাতে মায়ের চোখে এক ফোঁটা জল, টলমল করতে করতে মায়ের পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়ল, তার তাতে হল কি জানিস্? সপ্ত সমুদ্রের সৃষ্টি হল সপ্ত সমুদ্র গর্জ্জন করে উঠল— আর সমস্ত বিশ্বকে ডোবাবার জন্য ফুলে উঠল, ফেঁপে উঠল— এর মানে কি জানিস? হরিনামের মহিমায় যে এক ফোঁটাও প্রেম-অমৃত পান করে থাকে, সে সাত জন্মের খবর বলতে পারে, সাত সমুদ্রের কথা বলতে পারে, সপ্ত স্বর্গের মহিমা জানে, আর গায়ত্রী দেবীর সপ্ত মন্ত্রের বা ঐ সপ্ত সুর সরস্বতী ব্রহ্মবাণীতে যোগ হতে পারে। এই সাত সমুদ্রের গর্জন শুনে, মা ভগবতী পায়ের তালে সেই হরিনামের ঝুলিটিকে ছুঁয়ে দিল, অমনি পাতালপুরী থেকে মা বাসুকী জেগে উঠল — আর এই সপ্ত সমুদ্রকে বেড় দিয়ে ঘিরে ফেলল, আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সেই শিবের ঝুলি থেকে, মা কালী বেরিয়ে এল এক বিশ্বজগৎ জোড়া অঙ্গ নিয়ে, একেই মা, মহাকাল বলেন। এই মহাকালের কাছে সেই সপ্তসমুদ্র কেবল হাঁটুর নীচেই রয়ে গেল। মায়ের সৃষ্টি ডোবাতে পারল না। সেই মহাকালের হাঁটুর নীচেই তারা জপ-আরাধনায় নিযুক্ত হয়ে পড়লে; মা ভগবতী, এদের সকলকেই আবার সেই হরিনামের ঝোলাতে ঝুলিয়ে নিল।''

ঠিক এই সময়ের আগের মুহূর্ত্তেই স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন) ও গিরিশ ঘোষ অলক্ষ্যে তাঁর পূজার বাণী শুনতে শুনতে ভাববিমুগ্ধ হয়ে বেলতলার খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে রইল—গিরিশ ঘোষ নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন —''এমন হরিনামের ঝুলির ব্যাখ্যা বা দশমহাবিদ্যার সৃষ্টির ব্যাখ্যা তোমার বেদবেদান্তে আছে কি?''

নরেন উত্তর দিলেন, ''এর কিছু অংশ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু এমন সরলভাবে বর্ণনা করা এক বিরাট রহস্য, তাই ভাবছি, এঁর মুখ থেকে এমন বর্ণনা কেমন করে সম্ভব হল?''

মথুরবাবু বললেন—''তাঁর দুটো চোখই বন্ধ রয়েছে আর তাই দিয়ে অনবরত চোখের জলে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে, অলক্ষ্যে আমরা যে দাঁড়িয়ে তাঁর পূজা দেখছি, এ কথাও আবার পূজার মাঝেই মাকে উনি জিজ্ঞাসা করছেন—'মা! তুই আবার এ সময় ওদের কেন ডেকে আনলি? এ সময় কোনদিনই তো ওরা আসে না, তবে আজ এই প্রথম বেলতলায় পূজার দিনেই বা কেন এল?

মা তোর লীলাখেলা বুঝি না—একেই তো ওরা আমায়

পাগল বলে, আবার এ অবস্থা দেখে আরও তো বলবার সাহস পাবে'!''

রাণী রাসমণি মথুরবাবুর গা ছুঁয়ে বললেন — ''এখন ওসব কথা থাক না! ঐ শোন উনি কী বলে যাচ্ছেন''—

রামকৃষ্ণদেব বিহ্বলভাবে বলে যাচ্ছেন— ''জানিস নরেন! সেই হরিনামের ঝুলিতে মহাকাল আসতেই মায়ের আঁখিতারা থেকে অনন্ত বিদ্যুৎ শিখা ঝিলিক মেরে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব মহিমাময়ী মায়ের সৃষ্টি হল, এঁরই নাম মা-তারা—যাঁকে আমরা দ্বিতীয় মহাবিদ্যা বলি। এই মা তারার সৃষ্টিরহস্যের মানে কি জানিস? অনন্ত ব্যোম বা আকাশে আকাশে নক্ষত্র তারার সৃষ্টি। মায়ের আঁখিতারা জ্বলে উঠতেই আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষকোটি নক্ষত্র তারার সৃষ্টি হতেই সেই আদ্যা জগত্তারিণী মা, শুয়ে পড়ল, লক্ষ কোটি বিদ্যুৎজ্যোতিতে, মায়ের আঁখি ধাঁধিয়ে গেল। মায়ের এই শয়ান অবস্থাকেই তৃতীয় মহাবিদ্যা বলে। এই তৃতীয় মহাবিদ্যাকেই আবার স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলে। সেই আদ্যা ব্রহ্মময়ী মা, এই তৃতীয় মহাবিদ্যা যাকে আমরা কৃষ্ণের জননী বলি, তাকেও সেই হরিনামের ঝুলিতে তুলে নিল।''

রাণী রাসমণি চোখের জল মুছতে মুছতে মথুরবাবুকে বললেন—''মথুর আর তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পাচ্ছি না, আমার সর্ব্ব অঙ্গে কী এক আনন্দ হিল্লোলের আবেশ আসছে, অথচ এমন এক পূণ্য-তীর্থ ছেড়ে যেতে মন চাইছে না।''

নরেন গিরিশ ঘোষকে মধুর দৃপ্তকণ্ঠে বললেন— ''এ সময় এঁর অঙ্গ এক অনন্ত ছন্দ, নৃত্য, তাল সমন্বয়ে অনন্ত স্বর্গ-সুষমায় ভরপুর হয়ে গেল— এ সময় এঁকে দর্শন করলে অনন্ত স্বর্গ দর্শনেরই যেমন পুণ্যফল পাওয়া যায়, অন্য দিকে অবার সেই দেবদেবীগণের উপর ক্রোধেরও সঞ্চার হয়, তাই একবার মনে হচ্ছে ছুটে গিয়ে ওঁর পায়ের তলায় ধূলো হয়ে বাস করি। আবার মনে আসছে ঐ দুর্বৃত্ত বেলগাছটিকে ভেঙ্গে ফেলে চুরমার করে দিই। এমন সোনার অঙ্গকে, যে শক্তি ধূলো করে দেয়, এমন ভাবে অপমান করে, তাঁকেও ধূলো করে দিই।''

গিরিশ ঘোষ উত্তর দিলেন—''আমি অভিনয় করি মাত্র। তোমার অতশত পণ্ডিতি কথা বুঝিনা, আজকের এই ভাববিহ্বল পূজা দেখে মনে হয়—এঁর অভিনয় শুধু, ও-ভিন্ন অন্য কিছুই নয়— তাই বলছি হয় পালিয়ে চল— নয় জড়িয়ে ধর।''

রামকৃষ্ণদেব পূজার ঘোরে গিরিশের কথায় উত্তর দিয়ে যেন বলে যাচ্ছেন—''মা! তুই ভিন্ন এ অভিনয় কে করতে পারে? তোর নিজেরই অঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল এই তৃতীয় মহাবিদ্যা, আবার তুই তাকে তোর নামের ঝোলাতে তুলে নিলি? তোরই ছেলেমেয়েকে এই নিরাকার পূজার মাঝে টেনে নিয়েছিস, তা-ও আবার তাদের চলে যেতে বলছিস্! কেন যে আনিস্ আবার কেন যে ফিরিয়ে দিস্ তা তুই ভিন্ন আর কে অভিনয় করবে? জানিস নরেন, কৃষ্ণমাতা সেই মায়ের হরিনাম ঝুলিতে প্রবেশ করতেই অনন্ত আকাশ-বাতাস নক্ষত্র, তারাকুল আবার কেঁপে উঠলে, ভৈরব ঝঙ্কারে চারিদিক ছেয়ে উঠল—মাও সেই সঙ্গে একটু কেঁপে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে হরিনামের বীজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তাতে হল কি জানিস? সেই নামের বীজ থেকে অনন্ত কৃষ্ণ-অঙ্গধারী দেবদেবীরও সৃষ্টি হতে লাগল— মায়ের এই রূপধারীকৃষ্ণ অঙ্গকেই মা-ভৈরবী বলে। মর্ত্ত্যভূমিতে এরই নাম চতুর্থ মহাবিদ্যার পূজা নিবেদন। ওঁকার ধ্বনির, ওঁকার বাণীর এই চতুর্থ সৃষ্টিই ব্রহ্মধ্বনি, ব্রহ্মবাণী বীণাপাণি। অনন্ত আলোকরাশির জমাট শক্তিকেই কৃষ্ণশক্তি বলে। আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়া অনন্ত কৃষ্ণ-বীজের ভৈরব হুঙ্কারকেও মা হরিনামের ঝুলিতে তুলে নিল আর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ প্রতিমার মত অনন্ত ওঁকার কঙ্কাল সমস্ত বিশ্ব জুড়ে বসল—সেই কৃষ্ণবীজের নাম বাছাই হতে লাগল, লক্ষকোটি ধূমকিরণ, মা ধূমাবতীর আকারে সেই গোধূলি লগনে মায়ের পূজা করতে করতে আঁখিজল দিয়ে গেয়ে উঠল— 'জয় কৃষ্ণ, জয় কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হে! জয় রাম! জয় রাম! রাম হে!' ধূমাবতীর কণ্ঠ থেকে এই রামনাম ধ্বনি উঠতেই, রাম অঙ্গধারী, নব দুর্ব্বাদল শ্যাম রামরঘুমণির সৃষ্টি হল— মা ধূমাবতীর কৃষ্ণবাঁশীর সুর-বক্ষ একদিকে মা যেমন আলোধারা দিতে দিতে রাধানাম গেয়ে উঠল, অন্য দিকে রামরঘুমণির লক্ষকোটি তীর অনন্ত বিশ্বের তীরে গিয়ে — 'সীতা! সীতা!' বলে কেঁদে উঠল—মা, এই সীতাসত্যের শুভ্রবাণী আর এই রাধা নামের আলোকধারাকে নামের ঝুলিতে তুলে নিতেই অনন্ত বিশ্বজগতে নারায়ণের সৃষ্টি হোল, মায়ের বাম হাতে রামের তীর আর দক্ষিণ হাতে কৃষ্ণের বাঁশী আপন মনে বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলল —

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামহে
জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণহে।।''

..ক্রমশঃ